হেমন্ত মুখোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ

শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী

বাঙালির স্মৃতিতে, সত্তায় আর নস্টালজিয়ায় তিনি, তিনি অনুরোধের আসরে, মহালয়ায়, রকের আড্ডায়, যৌবনের স্পর্ধায় আর আবেগময়তায়, শারদীয়া সন্ধ্যায়, হতাশাঘেরা স্তব্ধতায় আবার উৎসবের উজ্জ্বল আঙিনায়। রান্না করতে করতে, কোলের শিশুকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে অথবা সাইকেলে প্যাডেল করতে করতেও তিনি, আবার মার্গো সাবানের গন্ধে, মায়ের আঁচলের হলুদ দাগে, এল পি রেকর্ডের ঘূর্ণিতে, ক্যাসেটের ফরোয়ার্ড রিওয়াইন্ডেও তিনি।

আজও তেমন মেঘলা বিকেল এলে, যখন গুনগুনিয়ে ওঠে মাঝবয়সি বাঙালির মন-কেমনেরা, 'মুছে যাওয়া দিনগুলি' যখন তাকে পিছু ডাকে, হাত ধরে তাকে নিয়ে যায় ষাট, সত্তর বা আশির দশকের সাদা কালো দুনিয়ায়, একশো পাওয়ারের বাল্‌বের হলদে আলো ঘেরা ল্যাম্প পোস্টের নিচে মায়াবী আলো-আঁধারের বৃত্তে ফিরে যায় সে। ফিরে যায় তার একান্নবর্তী অতীতে। আর তার 'স্মৃতি যেন হৃদয়ের বেদনার রঙে রঙে ছবি' আঁকতে থাকে হারানো সময়ের। 'নীল আকাশের নিচে' ঘুমিয়ে পড়া এই পৃথিবীর রাত্রির কান্না যেমন তিনি শুনিয়ে চলেন, তেমন 'ধিতাং ধিতাং বোলে'র মাদলে তান তুলে বাঙালির মনপ্রাণ ভরিয়ে তোলেন আনন্দে উচ্ছলতায়। সেই হাসির কলরোলে নতুন জীবন গড়ার আহ্বানেই তো বাঙালি এগিয়ে চলেছিল একদিন, তার আকাশ ভরে উঠেছিল আশ্চর্য 'জোছনায়'।

প্রায় দুই প্রজন্মের বাঙালিকে যিনি এভাবেই টেনে রেখেছিলেন—তাঁর ব্যারিটোন কণ্ঠের আশ্চর্য জাদুতে, মন্ত্র উচ্চারণের অনায়াস ভঙ্গিতে আর আদ্যোপান্ত বাঙালিয়ানায়—তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সদ্য স্বাধীন এক দেশে অনেক না পাওয়ার মধ্যে মধ্যবিত্তের ঘুমে-জাগরণে, স্বপ্নে-সাধে, তার বাদে-প্রতিবাদে, দুঃখজয়ের স্বপ্ন বুনে দিয়েছিলেন সাদা ধুতি, হাতা-গোটানো শার্ট আর কালো মোটা ফ্রেমের চশমা পরিহিত দীর্ঘদেহী এক বাঙালি গায়ক, সামনে রাখা শুধু তাঁর এক হারমোনিয়াম। তাঁর গানে না আছে ওস্তাদি কালোয়াতি, না আছে রাগাশ্রয়ী ধ্রুপদী ঘরানার সাবেকি ঐতিহ্য। আছে রবীন্দ্রনাথের গানের মতো অনায়াস এক সহজ সরল ভঙ্গি যা আধুনিক গানের বক্তব্যকে এমনভাবে সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে দেয় যে সেই আবেশ থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। বৈষ্ণব কবির ভাষায় যেন 'কানের ভিতর দিয়া

মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।' আসলে মধ্যবিত্তের সহজ জীবনবোধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া এই সুর আর স্বরের আশ্চর্য মেলবন্ধনের নেপথ্যেও সক্রিয় ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের এক সহজ জীবনবোধ। সেই জীবনপথের পথিকের ভ্রমণকাহিনিও তাঁর গানের মতোই আশ্চর্য, বাঁকে বাঁকে তার কত না বিস্ময়ের উপকরণ, ছন্দে ছন্দে কত রংবদলের বিচিত্র কাহিনি।

জীবনখাতার কয়েক পাতা

কতই বা বয়স তখন, সদ্য প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন থেকে। ভর্তি হয়েছেন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, জুটেছে একটা সাইকেল। ভবানীপুর থেকে রোজ কলেজ যাতায়াত চলছে সাইকেলে। বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে আর উদ্যোগে ততদিনে রেডিয়োতে গান গেয়ে পরিচিত মহলে বেশ খ্যাতি পেয়েছেন। যদিও বাবা খুব একটা খুশি হননি তাতে। গান নিয়ে এই মাতামাতি তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে, ভাল চাকরি করবে, সংসারের হাল ধরবে—এই তাঁর মধ্যবিত্ত ইচ্ছে। একেই স্কুলে একবার টিফিন পিরিয়ডে টেবিল বাজিয়ে বন্ধুদের গান শোনাতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল সে, তাড়িয়েই দিচ্ছিল প্রায়। অনেক কষ্টে সে-যাত্রায় রেহাই মিলেছিল। তাছাড়া পড়াশোনা ছেড়ে গানবাজনা নিয়ে মেতে উঠুক ছেলে, তিরিশের দশকে কোন মধ্যবিত্ত বাবাই বা তা মেনে নিতে পারেন? কিন্তু বন্ধুরা নাছোড়বান্দা, বিশেষত সুভাষ মুখোপাধ্যায়। স্কুলের ফাংশনে হেমন্তকে গান গাইবার অনুমতি দেওয়া হয়নি তো কী হয়েছে, রেডিয়োতে গান গাইবে হেমন্ত। প্রতিবাদী সুভাষের মামার বন্ধু তারাপদ মুখার্জির ছেলে 'কালো' তখন রেডিয়োতে তবলা বাজায়। অতএব ধরা হল তাঁকে, তারপর সেই কালোদা-র দৌলতেই গার্‌স্টিন প্লেসের রেডিয়ো অফিসে হেমন্তকে নিয়ে গিয়ে আধুনিক গানের অডিশন দিইয়ে আনলেন তিনি। সাল ১৯৩৬, দুজনেই তখন সবে দশম শ্রেণির ছাত্র, আর এই কালোদাই হলেন পরবর্তী কালে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা অসিতবরণ। কিন্তু রেডিয়ো থেকে চিঠি তো আর আসে না। সুভাষ অধৈর্য হয়ে ওঠেন কিন্তু হেমন্ত নির্বিকার। শেষ পর্যন্ত যখন চিঠি এল তার কয়েকদিন পরেই ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা। আহ্লাদে আটখানা হেমন্ত পড়াশোনা ভুলে তখনই দে ছুট সুভাষের বাড়ি। ওদিকে বাবা একেবারেই রাজি নন যে রেডিয়োতে গান গাইবে ছেলে, তরী বুঝি তীরেই ডুবে যায় আর কী! শেষে মা তাঁকে রাজি করালেন। এদিকে আর এক সমস্যা, কোন গান গাইবেন হেমন্ত? নতুন দুটি গান চাই। কে লিখে দেবে গান? কে দেবে সুর? কেন, সুভাষ! সে কবিতা লেখে আর গান লিখতে পারবে না? সুভাষ লিখবে গান, আর সুর—সে তো তৈরিই আছে। ঠিক হল, কমল দাশগুপ্তের সুরে যূথিকা রায় 'তোমার হাসিতে জাগে' বলে যে-গানটা গেয়েছেন তার সুর এক রেখে কথাগুলো বদলে দেবে সুভাষ। হেমন্তের অনুরোধে সারা দুপুর বসে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখে ফেললেন সেই গান 'আমার গানেতে এলে নবরূপে চিরন্তনী'। কিন্তু একটাতে তো হবে না, চাই আরও একটা গান। তাঁদের পাড়ায় থাকতেন নিরাপদ চক্রবর্তী, ভাটিয়ালি গান গাইতে পারেন। তাঁকে গিয়ে ধরল কিশোর হেমন্ত। শচীন দেববর্মনের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখন গান গাইবেন শচীন দেববর্মন, আর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তা শুনতে শুনতে গুনগুনিয়ে উঠবে সে। শচীন দেববর্মনের গান শুনে শুনে অনেক ভাটিয়ালি গান তার জানা ততদিনে। বড়ই প্রিয় সেইসব গান, তাছাড়া কপিরাইটের ঝামেলাও নেই তাতে। শিখে নিল তা। তারপর ওই দুটি গান বেজে উঠল রেডিয়োতে।

কিন্তু রেডিয়োতে গান গাইলে কী হবে, আসল কদর তো রেকর্ড বার করতে পারলে। বন্ধু সুভাষের বুকভরা আশা, হেমন্তের রেকর্ড বের হবে। ততদিনে পঙ্কজ মল্লিকের গায়কি অনুসরণ করে 'ছোট পঙ্কজ' হেমন্ত বেশ প্রশংসা পেয়েছেন, স্বয়ং পঙ্কজ মল্লিক পর্যন্ত রেডিয়ো স্টেশনে তাঁকে মজা করে বলেছেন, ''তুমি তো দেখছি আমাদের ভাত মারবে!'' কিন্তু সেনোলা, পাইয়োনিয়ার, মেগাফোন, এইচ এম ভি সবাই ফিরিয়ে দিল এই দুই উৎসাহী তরুণকে। কেউ রাজি হল না হেমন্তের গান রেকর্ড করতে। হতাশ সুভাষ হাল ছেড়ে দিলেন, তাছাড়া তিনি তখন ধীরে ধীরে রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠেছেন। পাশাপাশি চলছে কবিতা লেখা, আর হেমন্ত মেতে উঠেছেন গানের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চায়। কয়েকটা ছোট পত্রিকায় গল্প প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্রের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় হাতে লেখা পত্রিকা 'অর্ঘ্য' এগিয়ে চলেছে। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে গল্প 'একটি দিন'। আনন্দবাজার পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে গল্প। বন্ধুদের নিয়ে গড়া কল্যাণ সঙ্ঘের সাহিত্যপাঠের আসর জমে উঠেছে, পড়া হচ্ছে নিজেদের গল্প, কবিতা। আর তা নিয়ে আলোচনা করতে আসছেন সন্তোষকুমার ঘোষ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু সেনগুপ্ত; আমন্ত্রিত হচ্ছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রমুখ। কিন্তু রমাকৃষ্ণ আর সুভাষ দুজনেই একমত যে হেমন্তকে সাহিত্য নিয়ে মাতিয়ে রাখলে হবে না, ওকে গান গাইতেই হবে। গানের পথেই ওর যাওয়া উচিত। সাহিত্য ওর গানের সাধনার ক্ষতি করছে। তাঁরা সেকথা বলছেনও হেমন্তকে সরাসরি অকপটে।

তাঁদের ইচ্ছাই অবশেষে জয়ী হল। শেষ পর্যন্ত গানের রেকর্ড বের হল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের এবং অভাবনীয়ভাবে তা সম্ভব হল তাঁর বাবার উদ্যোগে। বাবা কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি অফিসের সহকর্মী শান্তি বসু কলম্বিয়া কোম্পানিতে চেলো বাজাতেন। তাঁর সঙ্গেই হেমন্ত একদিন গেলেন প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক শৈলেশ দত্তগুপ্তের কাছে। প্রতিভা চিনতে ভুল হল না শৈলেশবাবুর। হেমন্ত পেয়ে গেলেন গানের জগতে তাঁর প্রথম ও প্রধান অভিভাবককে। গানের প্রথাগত শিক্ষা প্রায় কিছুই জানা ছিল না তখন তাঁর, জানতেন না স্বরলিপি দেখে গান গাইতেও। ছিল অসামান্য এক কণ্ঠ, গায়কি, গানের প্রতি প্রবল ভালবাসা আর হার না মানা জেদ। শৈলেশ দত্তগুপ্ত ধীরে ধীরে তাঁকে সব শেখালেন। কলম্বিয়া কোম্পানির সংগীত বিভাগের কর্ণধার তিনি, তখন থাকতেন ভবানীপুরেই। পরে চলে গেলেন টালিগঞ্জে। হেমন্ত ছুটলেন সেখানে, গানের তালিম নিতে।

কিন্তু আসতে রোজই দেরি হয়ে যায়। আগে তো একদম দেরি হত না! শৈলেশবাবু খোঁজ নিয়ে জানলেন ট্রামের ভাড়ার পয়সা না থাকায় ভবানীপুর থেকে হেঁটে হেঁটে আসতে হয় হেমন্তকে। সেদিন থেকে হেমন্তকে তিনি ট্রামভাড়া দিয়ে দিতেন যাতে আর দেরি না হয়। তাঁর কাছেই শুরু হল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রকৃত সংগীতশিক্ষা। দশ দিনের মধ্যেই একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে রেকর্ড হয়ে গেল। রেকর্ডের প্রুফ কপি হাতে নিয়ে হেমন্ত ছুটে এলেন বন্ধু সুভাষের বাড়িতে। কিন্তু কারও বাড়িতেই তো গ্রামাফোন নেই, অগত্যা গ্রামাফোনের দোকানে গিয়ে শুনতে হল সেই গান। নরেশ্বর ভট্টাচার্যের লেখা, শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে 'বল গো বল মোরে' আর 'জানিতে যদি গো তুমি'। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম রেকর্ড বের হল তাঁর। তার দুমাস পরেই দ্বিতীয় রেকর্ড। জমে গেল সাম্মানিকের কুড়ি কুড়ি চল্লিশ টাকা, সেই টাকা দিয়ে বাবা কিনে দিলেন একটা হারমোনিয়াম। এতদিন নিজের বাড়িতে একটা হারমোনিয়ামও ছিল না তাঁর, প্রথম প্রথম হারমোনিয়াম বাজানোর জন্য চলে

যেতেন বন্ধু শ্যামসুন্দরদের বাড়িতে। সেখানেই হারমোনিয়াম শেখার শুরু। বন্ধু সুভাষের বাড়িতেও ছিল হারমোনিয়াম, আর বছরে একবার কাশীতে মামাবাড়িতে গেলে দিদিদের কাছে শিখে নিতেন গান। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে হারমোনিয়াম কেনার সংগতি ছিল না বাবার। কোনওরকমে মামাদের দৌলতে দেনাদারের হাত থেকে বাড়িটা রক্ষা পেয়েছিল, দুবেলা দুমুঠো খাবার জুটে যেত, জুটত পড়াশোনার খরচও, মাসতুতো দাদাদের পুরনো জামা পরেই কেটে যেত দিনের পর দিন। তার ওপর আবার হারমোনিয়াম! আত্মজীবনীতে তাই লিখেছেন, ''এবার ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেন যেন। তখন আমি যা চাইছিলাম তা বিফল হল না। চাইছিলাম একটা হারমোনিয়াম। আগের কুড়ি আর এখনকার কুড়ি মিলিয়ে হল চল্লিশ টাকা। সেই টাকা দিয়ে বাবা আমাকে একটা হারমোনিয়াম কিনে দিলেন। সে হারমোনিয়াম আজও আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে আছে। জার্মান রিড। এখনও ভালো বাজে। এইবার আমার খুব সুবিধে। আর হারমোনিয়ামের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হবে না। এখন নিজের বাড়িতে বসেই চালাতে পারব সঙ্গীতচর্চা।''[১]

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কাশীতে—মামাবাড়িতে, ১৯২০ সালের ২০ জুন। বাবা কালিদাস মুখোপাধ্যায়, মা কিরণবালা দেবী। দাদু ছিলেন সিভিল সার্জেন, এম বি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া কৃতী ছাত্র। হেমন্তদের চার ভাই ও এক বোনের জন্ম হয়েছিল ওখানে। ভাইবোনেদের মধ্যে হেমন্ত মেজো। বড় দাদা শক্তিদাস, সেজো ভাই তারাজ্যোতি, ছোট ভাই অমল, আর বোন নীলিমা। তাঁদের সকলকে নিয়ে হেমন্তের শৈশব কাটছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহড়ুতে পৈতৃক গ্রামে, বাঁশবন, পুকুর, গাছপালা, নদীনালা, মাঠ ঘাটে ঘেরা খোলা প্রকৃতির বুকে। কিন্তু ঠাকুমার মৃত্যুর পর সব ওলটপালট হয়ে গেল। পাঠশালার পড়া শেষ করে গ্রামের হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তখন সবে, বাবা সংসার তুলে নিয়ে চলে এলেন কলকাতায় নতুন বানানো ছাব্বিশের দুই-এর এ, রূপনারায়ণ নন্দন লেনের দু-কামরার ছোট্ট বাড়িতে। বাড়ির সামনেই নাসিরুদ্দিন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল তাঁকে। কয়েক বছর পর ভর্তি হলেন ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন স্কুলে। ভাগ্যিস স্কুল কর্তৃপক্ষ হাফ ফ্রিতে রাজি হয়েছিলেন, না হলে সেখানকার মতো সেযুগের বড়লোকের স্কুলে পড়ানোর খরচ জোটানো সম্ভব ছিল না তাঁর বাবার পক্ষে। সেই স্কুলের পরিবেশ-প্রতিবেশে আর বন্ধুদের সান্নিধ্যে এক নতুন জীবন পেয়েছিলেন হেমন্ত, পেয়েছিলেন এক নতুন জীবনবোধ।

প্রস্তুতির সেই পর্বে কঠিন লড়াই করতে হয়েছিল তাঁকে। বাবার প্রবল অমত সত্ত্বেও পড়া ছেড়ে দিলেন ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে। গানকেই সঙ্গী করে এগিয়ে চললেন। গানের জন্য বাড়িও ছাড়লেন, বালিগঞ্জে বন্ধুদের সঙ্গে মেসে কয়েক বছর কাটিয়ে দিলেন শুধু গান গেয়ে, গানের টিউশনি করে, আর বিভিন্ন আসরে গান শুনে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি কিছুটা আগ্রহ গড়ে উঠেছিল তাঁর এই সময়ে। প্রথমে কিছুদিন পাঁচুগোপাল বোসের কাছে তালিম নিলেন। ওদিকে আর্থিক সংকট তীব্র, কলম্বিয়া কোম্পানিও রেকর্ডের জন্য ডাকছে না আর নিয়মিত। মাঝে মাঝে রাইচাঁদ বড়াল আর পঙ্কজ কুমার মল্লিক ডেকে পাঠাতেন নিউ থিয়েটার্সে কোরাস গান গাইবার জন্য। এসবের মধ্যেই আবার সুযোগ এল উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষার, বন্ধু পরিমলের উদ্যোগে ফণীভূষণ ব্যানার্জির কাছে। ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁ সাহেবের শিষ্য ফণীভূষণ পরম মমতায় গান শিখিয়েছিলেন হেমন্তকে। কিন্তু বছর দেড়েক পরেই মৃত্যু হল তাঁর, ছেদ পড়ল সংগীত শিক্ষায়। জীবন তখনও বেশ টালমাটাল। টুকটাক

গান গেয়ে আর গানের টিউশনি করে কোনওরকমে দিন চলছে তাঁর। কিন্তু সেই বন্ধুবৎসল, মানবদরদি, মার্জিত রুচির মানুষটি সহজ সরল এক জীবনদর্শন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

পরবর্তী কালে তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের চিকিৎসার জন্য গানের আসরে এসে শুনলেন কিছু অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠানের আর এক শিল্পী সুচিত্রা মিত্র সেদিন আসতে পারছেন না। কথা ছিল দুজনে মিলে 'চণ্ডালিকা'র গানগুলো গাইবেন। সমস্যা নেই—একাই চণ্ডালিকার সব গান গেয়ে দিলেন তিনি। যাওয়ার আগে বন্ধু রমাকৃষ্ণ আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে কিছু টাকাও তুলে দিলেন সুকান্তের চিকিৎসার জন্য। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাঁর বরাবর। আশুতোষ কলেজে দুপুরবেলা পি সি সরকার ম্যাজিক দেখাবেন বলে প্রচার হয়েছিল কিন্তু দিনে দুপুরে খোলা মঞ্চে ম্যাজিক হয়? স্বাভাবিক, পি সি সরকার আসেননি। দর্শক শ্রোতারা ভীষণ উত্তেজিত। উপায়? হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একের পর এক গানের ম্যাজিক দেখিয়ে সকলকে সম্মোহিত করে রাখলেন। এই বা ম্যাজিকের থেকে কম কী?

আসলে মরমি মন আর ভীষণ দায়িত্ববোধ—এই দুইয়ের সম্মিলনই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর গানের মধ্যেও তাঁর এই ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। মৃত্যুশয্যায় অসুস্থ বেলা মুখোপাধ্যায়ের মাকে কথা দিয়েছিলেন যে, বেলাকে তিনি দেখবেন। তখন গানের জগতে বেশ নাম বেলার, বাবা নেই বাড়িতে, অনেকগুলো ছোট ছোট ভাইবোন তাঁর উপর নির্ভরশীল। অতএব বেলাকে দেখা মানে তাঁকে বিয়ে করা আর তাঁর ভাইবোনেদের দায়িত্ব নেওয়া। বাড়ির মত আদায় হল অনেক কষ্টে, কারণ নববধূকে নিয়ে আলাদা থাকতে হবে তাঁকে। এই সংসারে বেলাকে নিয়ে এলে তাঁর মাতৃহারা পিতৃহারা ভাইবোনেদের কী হবে? অগত্যা মা রাজি হলেন। ১৯৪৫ সালে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন তিনি। প্রতিশ্রুত হলেন আরও এক সংসারের সম্পূর্ণ দায় নিতে। পরবর্তী কালে যখন পাকাপাকি ভাবে বোম্বে চলে গেলেন তখনও নিয়ে গেলেন তাঁদের সবাইকে। এই দায়বোধ আর আদ্যন্ত স্নেহের স্রোতে ভেসে গেছেন চিরকাল তাঁর বন্ধু, আত্মীয়, পরিজন আর তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মানুষজন। শৈশবে অভাবের সংসারে বেড়ে উঠেছিলেন বলেই সারা জীবন পরিচিত-অপরিচিত বহু মানুষের অভাব দূর করতে সাধ্যমতো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সাহায্যের হাত। নতুন শিল্পী, সুরকারদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছেন সংগীতজগতে।

শিশিরভেজা কাহিনি এক...

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে এলেই যাঁর নাম স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে জাগে তিনি সলিল চৌধুরী। বাংলা গানে সুর ও শব্দের এমন আশ্চর্য রসায়ন আর কোনওদিন হয়নি, হবেও না। দুজনের আলাপের সূত্রপাত ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে। গণনাট্য সঙ্ঘের সক্রিয় সদস্য সলিল, হেমন্তও তখন আই পি টি এ-র গানের দলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন। একদিন তাঁর ইন্দ্র রায় রোডের বাড়িতে এলেন সলিল চৌধুরী ভূপতি নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে, তাঁর লেখা এবং সুর করা অনেকগুলি গান শোনালেন—সবগুলিই গণনাট্যের প্রতিবাদী গান। হেমন্ত দারুণ খুশি হলেন, কিন্তু বললেন এই গান ঠিক রেকর্ড করার উপযোগী নয়, কোরাস গান হিসেবেই এগুলি সফল। সেকথা বুঝলেন সলিল চৌধুরী। মনে একটু দুঃখ নিয়েই সিঁড়ি দিয়ে নামছেন তিনি। পেছনে এগিয়ে দিতে আসছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। হঠাৎ সলিল চৌধুরী থমকে দাঁড়ালেন, মনে পড়ে গেল একটা নতুন গানের কথা—যার অর্ধেকটা লিখে সুর করা হয়েছে সবে। আবার ফিরে এলেন তাঁরা এক

ইতিহাস রচনা করতে। বাংলা গানের এক নতুন আকাশ খুলে গেল সেই মুহূর্তে, ইন্দ্র রায় রোডের সেই ঘরে। সলিল চৌধুরী শোনালেন ''কোনও এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো।'' আপ্লুত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বললেন, বাকি গান ''তাড়াতাড়ি শেষ করে নিয়ে এসো।'' সেদিন রাত্রেই সলিল চৌধুরী লিখে ফেললেন গানের বাকি অংশ, হয়ে গেল সুর : ''ডাকিনী যোগিনী এল শত নাগিনী...।'' দুদিনের মধ্যেই গান তৈরি করে শুনিয়ে এলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে।

গান রেকর্ড করা হবে, কিন্তু সলিল চৌধুরীর খোঁজ নেই। তিনি তখন সুদূর সন্দেশখালিতে। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য তিনি, পুলিশ তাঁকে খুঁজছে আর তিনি তাদের চোখে ধুলো দিয়ে গ্রামের কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সেটা ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাস, সলিল শুনলেন তাঁর সেই গান হেমন্ত এর মধ্যে রেকর্ড করে ফেলেছেন, শুধু তাই নয়, গানের অর্কেস্ট্রেশনও করে ফেলেছেন নিজে নিজেই। বছর কুড়ি বয়স তখন তাঁর, তাঁকে দেখে লোকে বিশ্বাসও করত না যে গাঁয়ের বধূর গানের সুর আর কথা দুই-ই তাঁর। এর পরের বছর বের হল 'রানার'। সদ্য প্রয়াত সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা কবিতাকে সুর দিয়ে তার যন্ত্রানুসঙ্গ কী হবে তা নিয়ে একটু আলোচনা করার পর আবার গা ঢাকা দিতে হয়েছিল সলিল চৌধুরীকে। তাঁর অনুপস্থিতিতেই আবার সব দায় নিজে নিয়ে গান রেকর্ড করে ফেললেন হেমন্ত। তারপর সুকান্তের 'অবাক পৃথিবী'। অসামান্য জনপ্রিয়তা পেল সেসব গান। '৫২ সালে সলিল চৌধুরীর পিতৃবিয়োগের খবর শুনে তাঁকে নিজের সহযোগী হিসেবে বোম্বে নিয়ে যেতে চাইলেন হেমন্ত। রাজি হলেন না সলিল, কিন্তু শোনালেন পালকির গান। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দোবদ্ধ চরণগুলি হেলে দুলে ছুটে চলল আশ্চর্য সুরের মায়ায় বাঙালির মনের গলি থেকে রাজপথে।

সলিল চৌধুরী লিখেছেন, ''হেমন্তদার একটা বিশেষ গুণ ছিল,... সেটা হচ্ছে নতুন কিছুকে গ্রহণ করার ক্ষমতা, তাকে উপলব্ধি করার মতো বোধ। মানে, কোন পরীক্ষামূলক ব্যাপারকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করার সাহস হেমন্তদার ছিল।''[২] এর পরের বছরগুলিতে একের পর এক গান উপহার পেল বাঙালি শ্রোতারা। শুনল, 'পথে এবার নামো সাথী' আর 'ধিতাং ধিতাং বোলে'। ততদিনে অবশ্য সলিল চৌধুরী বোম্বে-প্রবাসী হয়েছেন। কলকাতা এবং বাংলা গানের সঙ্গে যোগাযোগ কমে এসেছে। দুজনেই সংগীত পরিচালনার কাজে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নিজেদের মধ্যে সাময়িক ব্যবধানও তৈরি হয়েছে কিছু স্বার্থপর মানুষের সাফল্যে। আবার মিটেও গেছে তা। কিন্তু বাংলা গান যেন খুঁজে পেয়েছে সুরে কথায় সমকালকে, সেই সময়ের যন্ত্রণাকে—স্বপ্নবিলাসের প্রচলিত পথে নয়। বাংলা গান সেই থেকেই, বাস্তবের নিজস্ব মাটিতে চলতে শুরু করল, পেল নতুন ঠিকানার সন্ধান।

ছন্দে ছন্দে কত রং বদলায়

কিন্তু হেমন্ত তো শুধুমাত্র বাংলার বা বাঙালির নন, তিনি সারা ভারতের। সুরের যদিও কোনও সীমারেখা নেই, নেই ভাষার বাঁধন, তবু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সর্বভারতীয় হয়ে ওঠার পেছনে সুরকার হিসেবে খ্যাতি অর্জনের মূলে বোম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অবদান অস্বীকার করা যায় না। গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা অবশ্য তার আগেই কলকাতায়, অমিয় বাগচীর লেখা 'কথা কয়ো নাকো শুধু শোনো' গানটি তাঁর সুরে তাঁরই কণ্ঠে প্রথম জনপ্রিয়তা পায়। প্লেব্যাকে এককভাবে গান গাওয়ার সুযোগ পান 'নিমাই সন্ন্যাস' ছবিতে, ১৯৪০ সালে। সেই সময়েই সুরকার কমল দাশগুপ্তের সান্নিধ্য পান। তাঁর কাছেই

হিন্দি গানের হাতেখড়ি সেই ১৯৪০ সালেই। তবে হিন্দি গানে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে বোম্বে যাওয়ার পরেই। গানের জন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেখানে পাড়ি জমান ১৯৫১ সালে। অবশ্য প্রথম বার সেখানে যাওয়া ১৯৪৪ সালে। না—গান গাইতে বা সংগীত পরিচালনার কাজে নয়—বেলা মুখোপাধ্যায়ের অভিভাবক হয়ে। 'কাশীনাথ' ছবির গানে জনপ্রিয়তা পাওয়া বেলা তখন বেশ পরিচিত নাম, বোম্বের বিখ্যাত সংগীত পরিচালক ক্ষেমচাঁদ-প্রকাশ তাঁর ছবিতে গান গাইবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বেলার মা হেমন্তকে ভীষণ বিশ্বাস করতেন। বড় ভরসা ছিল তাঁর ওপর। তিনি অনুরোধ করলেন, যদি হেমন্ত বেলাকে নিয়ে গিয়ে বোম্বেতে বেলাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন তাহলেই তাঁর পক্ষে বোম্বেতে গান গাওয়া সম্ভব। এত বড় সুযোগ হাতছাড়া করা যায় নাকি? হেমন্ত রাজি হলেন। বোম্বে গিয়ে হেমন্তের সঙ্গে পরিচয় হল প্রমথেশ বড়ুয়ার। ঠিক হল প্রমথেশ একটি বাংলা ছবি করবেন যেখানে হেমন্ত এবং প্রমথেশ দুজনে মিলে সংগীত পরিচালনা করবেন। কিন্তু সেই ছবি আর হল না। অবশ্য পরের বছরই একসঙ্গে দুটো বাংলা ছবিতে সংগীত পরিচালকের কাজ করলেন হেমন্ত—অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পূর্বরাগ' আর জ্যোতির্ময় রায়ের 'অভিযাত্রী'।

বোম্বেতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে প্রথম ডেকে পাঠান বিশিষ্ট পরিচালক শান্তারামজী, কিন্তু সেই ছবি হয়নি। এরপর ডাক এল পরিচালক হেমেন গুপ্তের কাছ থেকে। তিনি 'আনন্দমঠ' ছবি করবেন, কলকাতা থেকে হেমন্তকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান। হেমন্ত রাজি, নতুন কাজ নতুন চ্যালেঞ্জকে কোনওদিন ভয় পাননি তিনি। সেখানে গিয়ে পরিচয় হল শশধর মুখার্জির সঙ্গে। বোম্বে ছায়াছবির জগতে তখন তিনিই সব। আনন্দমঠ ছবিতে হেমন্ত সংগীত দিলেন কিন্তু সেই ছবি তেমন চলল না, যদিও লতা মঙ্গেশকরকে গিয়ে রাজি করিয়ে গাইয়ে নিলেন তাঁর সুরে 'বন্দে মাতরম্' গানটি। তাঁর 'জয় জগদীশ হরে' গানটিও জনপ্রিয়তা পেল। পরের ছবি 'শর্ত', সেখানে 'না ইয়ে চাঁদ হোগা' গানটিও গীতা দত্তের কণ্ঠে বেশ সাড়া ফেলল। কিন্তু ছবি না চললে গান তেমন চলে না, মনে একটু বিষাদ নিয়েই হেমন্ত ততদিনে সপরিবারে বোম্বেকে বিদায় দেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। সেকথা জেনে ডেকে পাঠালেন শশধর মুখার্জি, ধমক দিয়ে সেই পরিকল্পনা ছাড়তে বললেন আর দায়িত্ব দিলেন একটি নতুন ছবির সংগীত পরিচালনার। সেই ছবি হেমন্তকে বোম্বের মাটিতে শক্ত ভিতে দাঁড়ানোর সাহস দিল আর দিল মানসিক শক্তি। সেই ছবিই 'নাগিন'। বিজন ভট্টাচার্যের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিতে গোটা ভারতবর্ষ দুলে উঠল 'মন দোলে মেরা তন দোলে'র সুরে। ক্লাভিয়োলাইনে সাপুড়ের বাঁশি বাজালেন কল্যাণজী আর হারমোনিয়ামে সহকারী

সংগীত পরিচালক রবি, যিনি পরবর্তী কালে সংগীত পরিচালক হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র স্থান গড়ে নিয়েছিলেন অজস্র হিন্দি এবং মালয়ালম্ ছবিতে সুর দিয়ে। আনন্দমঠে কোরাস গায়কের দল থেকে তাঁকে সহকারী করে নেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সহকারী হিসেবে বহু বিখ্যাত গানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ১৯৫৪ সালে মুক্তি পেল নাগিন। আর পেছন ফিরে তাকাতে হল না তাঁকে। বোম্বে এবং কলকাতা দু-জায়গাতেই অবিশ্রাম কাজের আহ্বান। নতুন নতুন গানে, কথা ও সুরের সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে শ্রোতারা খুঁজে নিচ্ছেন তাঁদের নিজস্ব এক কক্ষপথ। যে-সুর সহজেই ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, নিজে নিজে বেশ গেয়েও ওঠা যায়, সহজে তা তো মানুষের মনে ঢেউ তুলবেই। একদিন প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্যে মন-কেমনেরা উঁকি দিলে সেই গান তো হয়ে উঠবেই এক স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

সাল ১৯৫৫। একটা সত্যি-সত্যি ঝড় উঠল বাংলা ছায়াছবির আকাশে। মুক্তি পেল 'শাপমোচন', যে-ছবির প্রতিটি গান মানুষের মনে আলোড়ন তুলে দিয়েছিল, 'ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস', 'ত্রিবেণী তীর্থপথে কে গাহিল গান', 'বসে আছি পথ চেয়ে', 'শোন বন্ধু শোন', 'সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা'—আর কোনও বাংলা ছবিতে একসঙ্গে এতগুলি কালজয়ী গান কোনওদিন হয়নি, বোধহয় হবেও না। উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেনকে পিছনে ফেলে এ-ছবির প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠল গান। তারপরেও অজস্র বাংলা ছবিতে সংগীত পরিচালনা করলেন হেমন্ত। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি সেই গানের রেশ বুকে নিয়ে তার স্বপ্ন রচনা করল। মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ধুয়ে ফেলে ফুরফুরে বৃষ্টি-ভেজা হাওয়া খেতে খেতে, সকালের রোদ মেখে বাজারের ব্যাগ হাতে গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, বাসে, ট্রামে বা ট্রেনে চেপে অফিস যেতে যেতে বালুকাবেলায় নিজের নামটি লিখে রাখল। সেই নামকে সাগরের ঢেউ এসে যেন মুছে গিয়ে গেল, কিন্তু সেই সুর—তাকে কি মোছা গেল? না। মোছা যাবেও না কোনওদিন। প্রায় পাঁচ দশক ধরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান, রোদ-জল-হাওয়ার মতো অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল বাঙালির জীবনে। ১৯৫৭-তে 'হারানো সুর', ১৯৫৮-তে 'লুকোচুরি', ১৯৫৯-এ নিজের প্রযোজিত ছবি 'নীল আকাশের নিচে', 'দীপ জ্বেলে যাই', ১৯৬০-এ 'বাইশে শ্রাবণ', 'কুহক', ১৯৬১-তে 'সপ্তপদী', ১৯৬২-তে 'দাদাঠাকুর', 'পলাতক'। এরপরেও 'সাত পাকে বাঁধা', 'বালিকা বধূ', 'বাঘিনী', 'মণিহার', 'কুহেলী', 'বিকেলে ভোরের ফুল', 'অগ্নীশ্বর', 'রাগ অনুরাগ', 'মাল্যদান', 'কপালকুণ্ডলা', 'শহর থেকে দূরে', 'সংসার সীমান্তে', 'ফুলেশ্বরী', 'দাদার কীর্তি'—একের পর এক ছবিতে তিনি শ্রোতার মনে মুগ্ধতার আবেশ রচনা করে গেছেন। 'নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা', 'তুমি শতদল হয়ে', 'যেও না দাঁড়াও বন্ধু', 'এক গোছা রজনীগন্ধা', 'খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার', 'বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা', 'কোনোদিন বলাকারা', 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা'—এরকম অসংখ্য গানে তিনি কণ্ঠের জাদু ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন।

হিন্দি ছবির জগতেও তাঁর সাফল্য ছিল নজরকাড়া। 'জাগৃতি' ছবিতে কবি প্রদীপের কণ্ঠে 'আয়ো বাচ্চোঁ তুমে দিখায়ে ঝাঁকি হিন্দুস্তান কি', আজও দেশপ্রেমের স্রোত এনে দেয় সকলের মনে। 'জাল' ছবিতে 'শুন যা দিল কি দস্তাঁ' গানটিও মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৬২ সালে মুক্তি পেল 'সাহেব বিবি গোলাম' এবং 'বিশ সাল বাদ'। 'বেকরার করকে হামে ইউ না যাইয়ে' গানে মাতোয়ারা হল শ্রোতারা। মুক্তি পেল 'কোহরা', 'অনুপমা'। অনুপমা-য় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় 'কুছ দিল নে কহা কুছ ভি নেহি', এবং ওই গানটিই লতা মঙ্গেশকরের গলায় মানুষের মনকে এক

অপার্থিব অনুভূতির স্তরে নিয়ে গেল, শ্রোতারা সংগীতের ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করল। ১৯৬৮-তে মুক্তি পেল 'দো দুনি চার', '৬৯-এ 'খামোশি'। 'ও শাম কুছ আজিব থি' গানের সুরে থমকে দাঁড়াল গোটা ভারত। মুগ্ধতার এক জগৎ তিনি উপহার দিয়ে গেলেন সকলকে।

নৌশাদ, মদনমোহন, লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল, শচীন দেববর্মন—এক এক জন দিকপাল সংগীত পরিচালক তখন বোম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে শাসন করছেন। তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সংগীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পাশাপাশি চলছে তাঁর গান—একদিকে বাংলা অন্যদিকে হিন্দি। গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় দুটি আলাদা সত্তা নয়, যদিও তার জন্য প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হয়েছে তাঁকে। বলা হয়েছে—একজন গায়ক আবার সংগীত পরিচালনা করবে কেন? তাঁর এই আশ্চর্য সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়েছেন অনেকে। কিন্তু হেমন্ত নির্বিকার, এসব সমালোচনাকে উপেক্ষা করেই তিনি এগিয়ে গেছেন তাঁর সংগীতের মতো সহজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতে। আপ্লুত করেছেন সব সময়ের সব বয়সের মানুষকে—যেমন গানে তেমন ব্যক্তিত্বে।

এই কথাটি মনে রেখো

শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম তেমন তাঁর ছিল না, ছিল না নাড়া বেঁধে বসে দিনের পর দিন দীর্ঘ সাধনার পরম্পরিত ঐতিহ্য, রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও তেমন রাবীন্দ্রিক ঘরানার উত্তরাধিকারও তাঁর নেই, অথচ তাঁর গান সাধারণ বাঙালিকে সম্মোহিত করে রেখেছিল দশকের পর দশক। কী আধুনিক, কী রবীন্দ্রসংগীত—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছে বাঙালি কৃতজ্ঞ এই কারণে যে, তাঁর গান বাঙালির ড্রয়িংরুম থেকে বৈঠকখানা সর্বত্রই সমাদৃত হয়েছিল। সামাজিক স্তরভেদেও তাঁর গানের পরিশীলিত রুচি সমান আবেদন রেখে গেছে সব শ্রেণির মানুষের কাছে। প্রবল বিশৃঙ্খল একদল শ্রোতাকে তিনি পেরেছেন রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়ে উত্তেজনা প্রশমন করাতে, নিয়ে যেতে অন্য এক জগতে। স্বভাবে কোমল কিন্তু আত্মবিশ্বাসে ভরা তাঁর উপস্থিতি শ্রোতার মনকে বদলে দিতে পেরেছে। একটা বাঁকবদলের সময়ের সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক আন্দোলন, জনমনের বিভ্রান্তির মধ্যেও তিনি আশ্চর্যরকম সফল। সব মানুষের কাছে সমান আদর তাঁর। কলকাতায় খেলতে আসা আমেদ খাঁ, ধনরাজ, বেঙ্কটেশরা পর্যন্ত তাঁর গানের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ধনরাজের অন্যতম প্রিয় গান ছিল 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'। ধনরাজ বারবার শুনতে চাইতেন তাঁর কাছে সেই 'কালা লেড়কির গান'। একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের গানকে বাঙালির মনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি শুরু করেছিলেন শ্রদ্ধেয় পঙ্কজ কুমার মল্লিক, কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁকে পূর্ণতা দিয়ে গেলেন। শান্তিদেব ঘোষ তাই বলেছিলেন, ''গুরুদেবের বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন গান যে সহজ সরল আবেদন নিয়ে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিয়েছে—সে ওই হেমন্ত।''[৩] বাঙালি অবাঙালি নির্বিশেষে তাঁর রবীন্দ্রসংগীত সাধারণ শ্রোতার কাছে অন্য এক আবেদন রেখে গেল। প্রত্যেকের মতো তাঁরও সীমারেখা ছিল এবং তা তিনি নিজেই সব থেকে বেশি জানতেন। কী গান কেমনভাবে গাইলে তা মানুষের কাছে সহজে পৌঁছবে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এই প্রাক্তন ছাত্রের সেই কারিগরিটা জানা ছিল বলেই তিনি এতটা সাফল্য পেয়েছিলেন। 'শাপমোচন' ছবিতে তিনি নিজেই সংগীত পরিচালক কিন্তু 'ত্রিবেণী তীর্থপথে' গানটির সুর করতে বললেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়কে, গাইলেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় এবং প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত সমালোচক

যথার্থই বলেছেন, ''সুরকার আকাশ থেকে কোনও সুরের উৎস পেতে পারেন না। তাঁকে মাটিতে থাকতে হয়। মানুষের কাছাকাছি থাকতে হয় এবং নিজস্ব সংস্কৃতির শিকড় খুঁজে দেখতে হয়, বুঝতে হয়।... সাধারণ মানুষ কোন সুরে স্বপ্ন দেখে, কোন সুরে অভিমান করে, কী সুরে দুঃখবোধ ব্যক্ত করে, আনন্দ অনুভূতি প্রকাশ করে হেমন্ত তা টের পেয়েছেন গণনাট্যের অভিযানে।''[৪]

স্বাভাবিক প্রাণবায়ুর মতো তাঁর এই সুর আমাদের যাপনের সঙ্গে এভাবে মিশে আছে বলেই তিনি আমাদের এত কাছের, এত নিজের। আর এর মূল প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাছেই তাঁর দীক্ষা, তাই রাগ-রাগিণীর দীর্ঘ ঐতিহ্যকে সেভাবে আত্মগত না করেও তিনি পেরেছিলেন কথাকে সুরে সাজিয়ে পরিদর্শন করতে। ১৯৪৮ সালে শান্তারামজীকে তিনি মোহিত করে দিয়েছিলেন 'শ্যামা'র গান শুনিয়ে। শান্তারামজীর মনে এই নবীন সংগীত পরিচালকের দক্ষতা নিয়ে একটু সন্দেহ ছিল। তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''আপনি পারবেন তো?'' উত্তরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''কিছু ভাববেন না শান্তারামজী। আমার গানের গুরু হলেন রবীন্দ্রনাথ। যেকোনও বিষয়েই ছবি করুন না, সব পাওয়া যাবে রবীন্দ্রকোষ থেকে। অফুরন্ত ভাণ্ডার ওঁর। সব আছে। আপনাকে আমি রবীন্দ্রনাথের শ্যামা শোনাচ্ছি, তাহলেই বুঝতে পারবেন। আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করে সব বুঝিয়ে দেব।''[৫] যদিও সেই প্রস্তাবিত ছবি হয়নি, কিন্তু মারাঠি চলচ্চিত্রের সেই প্রবাদপুরুষ সেদিন আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের আবেদন আর ঐশ্বর্যে। কথা ও সুরের সহজ চলাচল যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেই সুরসাধনা করেছিলেন হেমন্ত। ছিল তাঁর অসাধারণ পরিমিতিবোধ। গুরুত্ব দিতেন কাব্যময়তাকে, মার্জিত শালীনতাকে।

যে-সাংগীতিক প্রতিবেশে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন সেই তিরিশের দশকের শেষ আর চল্লিশের শুরুতে বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্দা, মহামারি—সব মিলিয়ে এক মহা বিশৃঙ্খলা। মানুষ দিশেহারা। বাংলা গান তখন নতুন এক গতিপথ খুঁজে নিতে চাইছে। কালোয়াতি গান আর পল্লীগীতি—এই দুই পথ ছেড়ে কথা ও সুরের সামঞ্জস্য নিয়ে জেগে উঠছে বাংলা আধুনিক গান। টপ্পা, ঠুংরি, খেয়াল আর রাগপ্রধান গানের প্রচলিত পথে নয়, থিয়েটারের চটুল গানের মধ্যেও নয়, সাধারণ বাঙালি নিজেকে খুঁজে পেল এই নতুন ধারার গানে। কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, কমল দাশগুপ্ত যে-পথে হাঁটা শুরু করলেন, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, অনুপম ঘটক, হিমাংশু দত্তের সুরে যে-পথ আরও প্রশস্ত হল, সেই পথেরই পথিক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি আত্মস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথের গান, বিশেষত তাঁর নৃত্যনাট্যের এবং গীতিনাট্যের গান। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর গানে ধ্রুপদ এবং লোকগীতিকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, সেই আদর্শকেই অনুসরণ করলেন হেমন্ত। 'ঝড় উঠেছে বাউল বাতাসে' গানে এভাবেই তিনি বাগেশ্রী রাগের প্রয়োগ ঘটালেন, আবার 'শোনো বন্ধু শোনো' গানটিতে দেখা গেল ভৈরবী আশ্রিত লোকগানের প্রভাব—কিন্তু কখনই তা প্রকট হয়ে উঠল না। গানের কথা বা ভাবকে মেলে ধরাই সুরের কাজ বলে তিনি মনে করতেন। তাই সুরসৃষ্টির সময় তাকেই প্রাধান্য দিতেন। সংযমী ছিলেন, সুরের মধ্যে আবেগের মাত্রা যাতে কথার সৌন্দর্যকে নষ্ট না করে, সে-ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি থাকত তাঁর।

আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শোনো

কিন্তু শুধুমাত্র সংগীত পরিচালক নয়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তো প্রথমত এবং প্রধানত একজন সংগীতশিল্পী। নিজের সুরেই তিনি গান গেয়েছেন

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্রের সঙ্গে

তা তো নয়, বহু সুরকারের সুরে তিনি গেয়েছেন কত ভুলতে না-পারা গান। শচীন দেববর্মন হেমন্তকেই নির্বাচন করে নিয়েছিলেন বারবার। শচীন দেববর্মনের সুরে দেব আনন্দের লিপে মোট বারোটি গান রেকর্ড করেছিলেন হেমন্ত, এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রতিটি গানই জনপ্রিয় হয়েছিল। যেমন বাংলায় উত্তমকুমারের লিপে দু-একটি ছাড়া সব জনপ্রিয় গানই হেমন্তের।

গায়ক হিসেবে নিজেকে গড়ে নেওয়ার লড়াইটা খুব সহজ ছিল না তাঁর। আধুনিক গান এবং রবীন্দ্র-সংগীত দুটি ক্ষেত্রেই হেমন্ত যে সফল হতে পেরেছিলেন তার জন্য শুধুমাত্র তাঁর অসাধারণ কণ্ঠই নয়, উচ্চারণ এবং গায়কির স্বকীয়তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সংগীত পরিচালনায় তিনি এলেন চল্লিশ দশকের শুরুতে হরিপ্রসন্ন দাসের সহকারী হিসেবে। তখন তাঁর গানের স্টাইল অনেকটাই পঙ্কজ মল্লিকের মতো। নিজেই বুঝলেন এবার বদলাতে হবে। নিজের স্টাইল না তৈরি করতে পারলে টিকে থাকা যাবে না। এ-বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি ছিল নির্ভুল। তিনি লিখেছেন, ''গোড়াতে আমি পঙ্কজদাকে অনুকরণ করে গান গাইতাম।... কিন্তু আর তো পরের পোশাক পরে ঘুরে বেড়ানো চলে না। নিজের পোশাক না হলে চিনবে কী করে লোকে? তাই নিজস্ব একটা ভঙ্গির দিকে নজর দিলাম। গানের উচ্চারণের দিকে। খুব স্পষ্ট হওয়া চাই, সেই সঙ্গে থাকা চাই মিষ্টত্ব। যা মানুষকে আকৃষ্ট করবে। এসব আস্তে আস্তে রপ্ত করলাম। উচ্চারণের ব্যাপারে অবশ্য গোড়া থেকেই আমি খুব সজাগ। উচ্চারণটা যেমন সঠিক হওয়া উচিত ঠিক সেইসঙ্গে দেখতে হবে স্বাভাবিকতা হ্রাস না পায়। এইসব দিকে তখন খুব নজর দিতে লাগলাম। আর এই করতে করতে নিজের একটা স্টাইল এসে গেল। সম্পূর্ণ নিজস্ব স্টাইল।''[৬]

আর এই স্টাইলটি তাঁকে আলাদা করে দিল। স্পষ্ট উচ্চারণ, মিষ্টত্ব আর ঈশ্বরপ্রদত্ত অসাধারণ কণ্ঠ—এই তিনটি কারণেই তাঁর স্টাইল মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি সহজে পৌঁছতে পেরেছিল। আমজনতা থেকে আমির খাঁ পর্যন্ত তাই তাঁর গানে আবিষ্ট হয়েছিলেন। অভাবের সংসার, সামনে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সুযোগ—সবকিছুকে দূরে ঠেলে তিনি গানকে নিজের জীবনের অবলম্বন করে তুলেছিলেন। সহজ ছিল না সেই যাত্রাপথ তাঁর গানের সুরের মতো, তবু অসাধারণ এই ব্যক্তিত্ব শুধু গানেই নয়, আচারে-ব্যবহারে সকলের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। ঔদার্য ও মহত্ত্বে সহশিল্পীদের কাছে পেয়েছিলেন সম্মান আর অনুজ শিল্পীদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন পরম আশ্রয়ের ঠিকানা। বোম্বেতে যখন থাকতেন, কত উঠতি নতুন শিল্পীকে যে আক্ষরিক এবং মানসিক আশ্রয় দিয়েছেন তার ঠিকানা নেই। লতা মঙ্গেশকর বলেছিলেন, হেমন্তদার গান শুনলে তাঁর মনে হয় কোনও সাধু মন্দিরে বসে ভজন গাইছেন। উৎপলা সেন অবাক হয়েছেন, তাঁকে দেখতে এসে কখন

তাঁর বালিশের নিচে পাঁচশো টাকা রেখে গেছেন অলক্ষ্যে। তাঁর প্রযোজিত ছবিতে লতা মঙ্গেশকর পারিশ্রমিক নিতেন না। পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, ''নিজের বোন হলে দিতে পারতেন?'' ট্রেনে নিজের ইস্ত্রি করা ধুতি পেতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের জন্য বিছানা করে দিয়ে, নিজের দুটো শার্ট গুটিয়ে বালিশ বানিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ''এবার শুয়ে পড়ো।'' গলায় অসুবিধে থাকায় নিজে গান গাইতে পারছেন না, ওদিকে তরুণ মজুমদারের ছবির গানের ট্র্যাক রেকর্ড করা, শুটিংয়ের দিন এগিয়ে আসছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজেই গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন বিরাটিতে শিবাজী চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তাঁকে শিখিয়ে তাঁকে দিয়েই গাইয়ে নিলেন। গেঁওখালিতে নিজের পরিচালিত ছবি 'অনিন্দিতা'র শুটিং-শেষে অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের গান শুনে এইচ এম ভি থেকে তাঁর গান রেকর্ড করানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। জানতেন মৃণাল সেনের আর্থিক অবস্থা তখন খারাপ, তাঁর চিত্রনাট্য শুনে খুশি হয়ে চার হাজার টাকা তো দিলেনই, সঙ্গে প্লেনে ফেরার টিকিট, আর সেই ছবি পরিচালনার সুযোগ। ছবিটি 'নীল আকাশের নিচে'। মৃণাল সেন লিখেছেন, ''আমার চলচ্চিত্র জীবনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অবদান কম নয়। উনি সেদিন সুযোগ না দিলে আজ হয়তো আমি এখানে এসে পৌঁছতেই পারতাম না।''[৭] বাবা কালিদাস মুখোপাধ্যায় নিজের উদ্যোগে একটি হোমিয়োপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় চালাতেন। তাঁর মৃত্যুর পর হেমন্ত নিজেই সেই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

এই আশ্চর্য খোলা মনের উদার মানুষটির বাস্তব উপলব্ধিও ছিল অসাধারণ। এক প্রয়াত সুরকারের পরিবারের সাহায্যের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসেছেন। সকলে ভেবেছিলেন উনি পারিশ্রমিক নেবেন না। কিন্তু উনি তা নিয়েই গান গাইতে উঠলেন। অনুষ্ঠান শেষ করে সেই সুরকারের স্ত্রীর হাতে নিজের পারিশ্রমিক এবং গাড়িভাড়া বাবদ প্রাপ্য পুরো টাকাটা তুলে দিয়ে বললেন, ''অনুষ্ঠান থেকে কী পাবেন কী না পাবেন তার ঠিক নেই। এই টাকা কটা রাখুন।''

এই সেই মানুষ যাঁকে দেখতে আর ছুঁতে হাজার হাজার মানুষ একদিন ছুটে এসেছিল সুদূর ওয়েস্ট ইন্ডিজে। জামাইকা, ত্রিনিদাদ, সুরিনামে তারা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে ছুঁয়ে স্পর্শ করতে চেয়েছিল ভারতবর্ষকে, তাদের ফেলে আসা দেশ, ফেলে আসা ভালবাসা আর পূর্বপুরুষের স্মৃতিকে; যেভাবে তাঁর গান ছুঁয়ে গিয়েছিল ভারতবাসীকে, বিশ্বের সকল নাগরিককে। বাঙালির প্রাণে মনে তিনি ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন এক প্রশান্তি। সে চোখ বোজে আর তার সামনে দিয়ে বয়ে যায় 'শান্ত নদীটি, পটে আঁকা ছবিটি'—যে-ছবি আর সুর বাংলার আর বাঙালির আবহমানের, অহংকারের, বড় আদরের, বড় আপনার।

তথ্যসূত্র

১। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, *আনন্দধারা*, ভাদ্র ১৯৬২ (নিউ বেঙ্গল প্রেস), পৃঃ ২৫ [এরপর, *হেমন্ত মুখোপাধ্যায়*]

২। *আনন্দলোক*, বর্ষ ১৫, ২৮ অক্টোবর, ১৯৮৯, পৃঃ ২৮ [এরপর, *আনন্দলোক*]

৩। তদেব

৪। *সুরের স্বরলিপি*, বিনয় চক্রবর্তী, হেমন্তর কী মন্তর, (মিত্র ও ঘোষ : কলকাতা, ১৪০৬), পৃঃ ৬০

৫। *হেমন্ত মুখোপাধ্যায়*, পৃঃ ৫১

৬। তদেব, পৃঃ ৩৯

৭। *আনন্দলোক*, পৃঃ ২১